ছাত্ররাজনীতি থেকে কী পাচ্ছি

ইসমাইল সাদী

০৮ অক্টোবর ২০১৯, ২১:২২
আপডেট: ০৮ অক্টোবর ২০১৯, ২২:৪৫

আবরার ফাহাদের নৃশংস হত্যার প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে বুয়েটের সাবেক শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ মিছিল। ছবি: প্রথম আলো

সোমবার সকালে গণমাধ্যমের সুবাদে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ছাত্র আবরার ফাহাদের নৃশংস হত্যার ঘটনার কথা জানতে পারি। এরপর থেকে

একমুহূর্তও স্বাভাবিক থাকতে পারেনি। ওর বয়স ২১। শিক্ষকতার সুবাদে এখন এই বয়সী শিক্ষার্থীরা আমার ছাত্র। প্রতিনিয়ত তাদের আদর্শের কথা, মানবিকতার কথা, সমানুভূতির কথা, সততার কথা, দেশপ্রেমের কথা, মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের কথা বলতে হয়। আবরার ফাহাদ আমারও শিক্ষার্থী হতে পারতেন, আমার স্বজন হতে পারতেন!

বাড়িতে পড়া হচ্ছিল না বলে মায়ের কাছ থেকে ছেলেটি হলে চলে এলেন প্রিয় শিক্ষাঙ্গনে। আর এক দিন যদি বাড়িতে থাকতেন, পূজার ছুটি যদি কাটিয়ে আসতেন, তাহলেও কি ওকে এভাবে হত্যার শিকার হতে হতো? আবরারের মা-বাবা তা কেমন করে মেনে নেবেন। প্রতিদিনের মতো আর কখনো ভোর আসবে তাঁদের জীবনে? বুকের মানিক আবরারকে ছাড়া কীভাবে বাঁচবে মা-বাবা। আমিও তো সন্তানের পিতা। বেঁচে থাকলে আজ থেকে ১৪-১৫ বছর পর আমার সন্তানও তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে। তখনো কি পরিবেশ এমনটাই থাকবে, নাকি আরও অবনতি হবে? এমন নানা চিন্তা-দুশ্চিন্তার ঘোরে কেটেছে কাল সারা দিন। কী দোষ ছিল আবরারের? আবরার ছাত্রলীগের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, এটাই তাঁর অপরাধ? আবরার ভারত ও বাংলাদেশের সাম্প্রতিক চুক্তি বা সমঝোতা-চুক্তির সমালোচনা করেছেন? এসব ভাবতে ভাবতেই মনে পড়ে গেল, ফরাসি পণ্ডিত ভলতেয়ারের একটি মন্তব্য, ‘আমি তোমার মতের সাথে একমত নাও হতে পারি, কিন্তু তুমি যাতে তোমার মত অবাধে বলতে পার, তার জন্য আমি নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত।’ আমার ধারণা, যেকোনো গণতন্ত্রমনা মানুষের এ মতকে সমর্থন করতে দ্বিধা থাকে না।

প্রতিটি সংগঠনের কিছু না কিছু আদর্শ থাকে, বিশ্বাস থাকে; যার ওপর ভিত্তি করে সংগঠন পরিচালিত হয়। আবরারের মতকে মেনে না নিয়ে আরও ১০টি মত দেওয়া যেত, আদর্শের লড়াই হতে পারত। দেশবিরোধী কোনো কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ততার সন্দেহ থাকলে পুলিশকে খবর দেওয়া যেত। হাজারটা পথে তাঁকে শোধরানোর ব্যবস্থা করা যেত। কিন্তু ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সেদিকে না গিয়ে নিজেদের হন্তারক হিসেবে প্রমাণ করলেন। যাঁরা আবরারকে মেরেছেন, তাঁরাও তো তাঁর সহযাত্রী-বুয়েটেরই মেধাবী ছাত্র। তাহলে তাঁদের এই ভূমিকায় আনল কে? বিশ্ববিদ্যালয়? নাকি রাজনীতি? নাকি আমাদের সমাজ? আমরা এর উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব।

২০০৫ সাল। আমি তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহমখদুম হলের আবাসিক ছাত্র। ডিসেম্বরের কনকনে শীতের এক রাতের ঘটনা। দুইটার মতো বাজে। আমার রাত জেগে পড়ার পুরোনো অভ্যাস। হঠাৎ টুংটাং আওয়াজ। আওয়াজটি প্রথমে কয়েক সেকেন্ড পর পর এলেও ক্রমশ তা ঘন ঘন আসতে থাকল। প্রথমে ভাবলাম, হয়তো কেউ রান্না করছেন। পাতিল-হাঁড়ির শব্দ হবে। মিনিট পাঁচেক লাগাতার চলার পর কৌতূহলী হয়ে বের হলাম। শব্দটি আসছে তৃতীয় তলার বাথরুম থেকে। সেই বাথরুম থেকে আমার রুমের দূরত্ব ১০ গজের মতো। আমি চিৎকার করতে করতে এগিয়ে গেলাম। সেই টুংটাং শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এবার শুনতে পেলাম আর্তনাদ, ‘আমাকে মেরে ফেলল, বাঁচান বাঁচান।’ কী করব বুঝতে পারছিলাম না। দেখি বাথরুমের লাইট অফ। বাথরুমে ঢোকার মুখেই আমাকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেল তিন-চারজন দুর্বৃত্ত। আবছা আলোয় দেখলাম, তাদের প্রত্যেকের হাতে রড, লাঠি। বারান্দার লাইট অন করে চিৎকার করলাম, ‘সবাই বেরিয়ে আসুন, হলে সন্ত্রাসী এসেছে।’ গভীর রাত তো। অন্য ছাত্ররা বেরিয়ে আসতে আসতেই ওরা নিরাপদে চলে গেল দোতলায়।

আমার রুমমেটসহ আশপাশের সবাই এগিয়ে এল। দৌড়ে এলেন শিবিরের নেতা-কর্মীরাও। তাঁদের বললাম, ‘আপনারা গেট বন্ধ করে দিন। পালাতে পারবে না। হলেই আছে ওঁরা।’ মার খাওয়া সেই ছেলেটি আমার এক ইয়ার জুনিয়র। খুবই ভদ্র। তিনি ভয়ে কাঁপছেন তখনো। উঠতে পারছেন না। বাথরুমে ফ্লোরে ফেলে পায়ের গিঁটে গিঁটে পিটিয়ে জখম করেছে। এর মধ্যেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন, কারা আপনাকে পেটাল? কিছু অনুমান করতে পারেন?’ বললেন, কদিন আগে তাঁদের জেলা সমিতির কমিটি নিয়ে সামান্য দ্বন্দ্ব হয়েছিল ছাত্রশিবিরের এক নেতার সঙ্গে। সম্ভবত এটারই জের। আমার তৎপরতা দেখে রুমমেট আমাকে টেনে নিয়ে গেল রুমে। ধমক দিল। বলল, ‘কিছু বোঝো না! এটা কাদের কাজ জানো না!’ আমি হতভম্ব।

ছাত্রশিবিরের কর্মীরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেলেন ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে। তাঁর জন্য নিচের তলায় রুমের ব্যবস্থা করা হলো। চিকিৎসা, চিকিৎসক, ওষুধ, সেবাযত্ন সব ফ্রি। ৮-১০ দিন পর থেকে সেই মার খাওয়া

ছাত্রটির আচরণে পরিবর্তন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা হলেও কথা না বলার চেষ্টা করেন। খোঁজ নিলাম অন্যভাবে। জানলাম, তিনি এখন ছাত্রশিবিরে যোগ দিয়েছেন। ছাত্রশিবিরের ছাত্রদের আমি আগে থেকেই এড়িয়ে

মারধরের পর ছাত্রলীগের কয়েকজন বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে বের করে নিয়ে যাচ্ছেন। ছবি: সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে

চলি, তিনি সেটা জানতেন। ফলে তিনি নিজে থেকেই আমাকে এড়িয়ে চলা শুরু করেন।

২.

বাংলাদেশে ছাত্ররাজনীতির একটি সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ইতিহাস কিন্তু চলমান থাকে না। নব্বইয়ের দশকের পর থেকে যে ছাত্ররাজনীতি আমরা দেখছি, তাতে কে হলফ করতে বলতে পারবে, ছাত্ররাজনীতি জাতীয় রাজনীতির প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে? একানব্বইয়ে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর ছাত্ররাজনীতি ক্ষমতাসীন দলের পকেটে ঢুকে যায়। রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের স্বার্থে ছাত্রনেতাদের ব্যবহার শুরু করেন। এরপর ক্ষমতার পালাবদল ঘটেছে। ছাত্রসংগঠনগুলোও ক্যাম্পাস দখল-পাল্টা দখল করেছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাস একবার ছাত্রদলের হাতে, আরেকবার ছাত্রলীগের হাতে গিয়েছে। কোনো ক্যাম্পাস ছিল ছাত্রশিবিরের হাতে। ২০০৯ সাল থেকে যেহেতু আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন, তাই ছাত্রলীগও সারা দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। কিন্তু আধিপত্য মানে তো আর জনপ্রিয়তা নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে। সাধারণ ছাত্ররা প্রমাণ করে দিয়েছেন, তাঁরা কোনো বড় দলের লেজুড়বৃত্তি করা ছাত্ররাজনীতি পছন্দ করেন না। যদিও ডাকসু নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ। প্রথম আলোর সম্পাদক মতিউর রহমানের একটি বই আছে, 'মুক্ত গণতন্ত্র, রুদ্ধ রাজনীতি'। দুই দলের ছাত্ররাজনীতির দৌরাত্ম্য নিয়ে তিনি সে বইয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আসলে সাধারণ মানুষের মনে বড় প্রশ্ন, নব্বই-পরবর্তী সময় থেকে কী কাজে এসেছে ক্ষমতাসীন দলের লেজুড়বৃত্তির ছাত্ররাজনীতি? কী কাজে লাগে ছাত্ররাজনীতি? 'ছাত্র'র মতো পবিত্র শব্দের সঙ্গে জুড়ে বসানো এই সংগঠন কি কখনো সাধারণ ছাত্রদের দাবির সঙ্গে কোনো বিষয়ে একমত পোষণ করেছে? বরং প্রশাসনের তাঁবেদারি করেছে। আর করেছে মাস্তানি, চাঁদাবাজি।

৩

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে হাজারো সমস্যা। এর মধ্যে কখনো কোনো দিন ছাত্রলীগ ছাত্রদের কল্যাণে কি একটি দাবি জানিয়েছে? খাবারের মান উন্নয়ন, আসন-সংকট, ভর্তি ফি কমানো, গুচ্ছপদ্ধতিতে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া, শিক্ষকদের বিরুদ্ধে ওঠা যৌন হয়রানির অভিযোগ ইত্যাদি কারণে কি তারা কখনো সাধারণ ছাত্রদের দাবির সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে? ছাত্ররা কি কোটাবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একমত পোষণ করেছে? তাহলে কেন এই ছাত্ররাজনীতি? বরং তারা প্রশাসনের পক্ষ নিয়ে ছাত্রদের নির্যাতন করেছে। ডাকসু নির্বাচনে জয়ী ছেলেটা যেখানেই যায়, সেখানে মারধরের শিকার হয়েছে।

ছাত্রলীগের আদর্শ কী আসলে? বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই সংগঠনটির নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা কিসের আদর্শের চর্চা করেন? তাঁরা কি পড়ে দেখেছেন, 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' নামে বঙ্গবন্ধুর লেখা বই দুটি? তাঁরা কি জানেন, মুসলিম লীগের ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীরা তৎকালীন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর যেভাবে হামলা করতেন বর্তমান ছাত্রলীগ একই কায়দায় সাধারণ ছাত্রদের ওপর কিংবা ভিন্নমত পোষণকারী ছাত্রদের ওপর হামলা করছে? ছাত্রলীগ জানে, তাদের মধ্যে কী পরিমাণ ছাত্রশিবির আর ছাত্রদল অনুপ্রবেশ করেছে?

বুয়েট দেশের সবচেয়ে মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতিষ্ঠান। আবরার হত্যায় যাঁরা জড়িত, তাঁরা তো আগে এমন ছিলেন না। তাঁদের হন্তারক করে গড়ে তুলল কে? তাঁদের অসহিষ্ণু হওয়ার সুযোগ দিল কে? নিশ্চয়ই পাঠ্যবই কিংবা শিক্ষকেরা তাঁদের ইন্ধন জোগাননি। তাহলে নিঃসন্দেহেই বলা যায়, ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণেই তাঁরা খুনি হওয়ার মতো বিপথগামী হয়েছেন। কারণ, ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এখন এই মনোবৃত্তি কাজ করে, ওঁরা কোনো অপরাধ করলে তার বিচার হবে না। নিকট অতীতে তো তেমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবুবকর, হাফিজুর মোল্লা, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবায়ের, ঢাকা মেডিকেল কলেজের আবুল কালামের হত্যাকাণ্ডের তো বিচার করেনি প্রশাসন। সেসব মামলার খবর এখন আর কেউ রাখে বলে মনে হয় না। বুয়েটও এবার রক্তাক্ত হলো। সুতরাং ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী হলে বিচারের আওতায় পড়তে হবে না, এই নিশ্চয়তা যদি পাওয়া যায়, তবে এমন আচরণ তো হতেই পারে। অর্থাৎ মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হয়ে ছাত্রলীগের নেতা হওয়ার সুবাদে তাঁরা হত্যায় জড়িত হয়ে গেলেন! আদর্শবর্জিত এই ছাত্ররাজনীতি বন্ধ হোক। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও এর দায় নিতে হবে। কেননা, এর আগের মারধরের ঘটনাগুলোর একটারও বিচার হয়নি।

যেকোনো সংগঠনের আদর্শের চর্চা হওয়া উচিত। বর্তমান ছাত্রলীগে তার ছিটেফোঁটাও হয় না। যে ছাত্রসংগঠন কোনো আদর্শকে লালন করে না, সেই সংগঠনের প্রয়োজন কি ফুরিয়ে যায় না। দেশের কোনো কাজে আসছে এই সংগঠনের রাজনীতি? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রতিনিয়ত দেশকে এগিয়ে নিতে কাজ করছেন, দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালাচ্ছেন দলমতের ঊর্ধ্বে উঠে, তখন এই সংগঠনটির বিশৃঙ্খলাপনা তাঁকেসহ গোটা জাতিকে বিব্রত করছে।

আমরা তো চাই না, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া এই সংগঠনের নাম নিয়ে লোকজন আজেবাজে কথা বলুক। আমরা চাই না, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম এই সংগঠন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে দেশের সবচেয়ে অজনপ্রিয়-অগ্রহণযোগ্য সংগঠনে পরিণত হোক। আমাদের চাওয়া, ছাত্ররাজনীতি করতে গেলে ছাত্রদের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে, দেশের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, সমানুভূতির চর্চা করতে হবে, টেন্ডারবাজি-চাঁদাবাজি বাদ দিয়ে সততার সঙ্গে চলতে হবে।

লেখক: ইসমাইল সাদী, লেখক ও সংস্কৃতিকর্মী (saadi.jamalpur@gmail.com)